



## Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 299 - 307

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: [editor@tirj.org.in](mailto:editor@tirj.org.in)

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

# সমাজবাস্তবতার বহুস্বর : প্রসঙ্গ অনিতা অগ্নিহোত্রীর 'মহুলডিহার দিন'

অধ্যাপক সাধন কুমার সাহা

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা

Email ID: [sksahaugb@gmail.com](mailto:sksahaugb@gmail.com)



ও

রিম্পা খাঁ

গবেষক, বাংলা বিভাগ

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা

Email ID: [rimpakhan1@gmail.com](mailto:rimpakhan1@gmail.com)



0009-0004-5418-5706

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

### Keyword

Social reality,  
Society,  
Literature,  
Brahmani  
River, Mahua  
tree, Power  
dynamics,  
Bengali novels,  
Psychological,  
Urban life,  
Mahuldiha.

### Abstract

Social reality refers to the existing real-world situations, structures, values, power dynamics, relationships, and lifestyles within a society, which profoundly influence an individual's thoughts, behavior, and way of life. It is not merely a collection of individual experiences, but rather a composite of social norms, cultural institutions, and structures that transcend the individual. Since literature is a mirror of society, the reflection of social reality in literature is inevitable. Fiction, in particular, is considered the most powerful medium for portraying the multifaceted reality of society. The reflection of social reality is a significant and continuous trend in Bengali novels. Although this trend began with Bankim Chandra Chattopadhyay, it gained depth and breadth in the works of Rabindranath Tagore, Sarat Chandra Chattopadhyay, Manik Bandyopadhyay, and Tarashankar Bandyopadhyay. In the postmodern era, social reality has taken on a more subtle, psychological, and introspective form. Anita Agnihotri is one of the most important fiction writers in this tradition. In her novels, the multifaceted reality of contemporary society is reflected with profound artistic consciousness and sensitivity. Her literary works primarily focus on the struggles of marginalized people, family complexities, the existential crisis of women, the mechanization of urban life, and the decay of social values. Her novels are not merely event-driven narratives; rather, they are powerful artistic mediums for uncovering the deeply rooted inequalities, inconsistencies, and crises of society. In the novel 'Mahuldihar Din' (The Days of Mahuldiha), she has artistically presented the

*life reality of the tribal-dominated Mahuldiha region. The lives of the people in this region, surrounded by the Brahmani River and hilly forests, are dependent on the forest, uncertain agriculture, and a deep connection with nature. The Mahua tree, folk culture, the cycle of seasons, and the depiction of working life are realistically portrayed in this novel. Furthermore, this article will discuss various aspects of social reality, including the life struggles of marginalized people, the existential crisis of women, family complexities, social inequality, and administrative inconsistencies, as revealed in the novel 'Mahuldihar Din'.*

## Discussion

সমাজ বাস্তবতা বলতে সমাজে বিদ্যমান সেই বাস্তব পরিস্থিতি ও অবস্থাসমূহকে বোঝায়, যা মানুষের জীবনধারা, চিন্তাভাবনা, আচরণ, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তোলে ও নিয়ন্ত্রণ করে। এটি শুধু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার যোগফল নয়; বরং ব্যক্তির বাইরে অবস্থানকারী সামাজিক কাঠামো, নিয়মনীতি, মূল্যবোধ ও ক্ষমতার সমন্বিত রূপ, যা ব্যক্তির চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। এ প্রসঙ্গে পরিমল ভূষণ কর বলেছেন –

“প্রত্যেক সমাজে বসবাসকারী লোকেদের জীবন-যাপন করিবার প্রণালীতে একটি স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে। এইরূপ স্বতন্ত্র জীবন-যাপন করিবার প্রণালীকে সমাজতত্ত্ববিদগণ সেই সমাজের culture বা জীবন-ধারা নামে অভিহিত করিয়াছেন।”<sup>১</sup>

অর্থাৎ পরিমলবাবু বলতে চেয়েছেন প্রতিটি সমাজের মানুষের জীবনযাপনের ধরন এক রকম নয়। মানুষের চিন্তাধারার ধরন, কথা বলার ভঙ্গিমা, পোশাক-পরিচ্ছদ, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, মূল্যবোধ ও বিশ্বাস – এই সবকিছু মিলিয়ে প্রতিটি সমাজের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবনধারা গড়ে ওঠে। আর সাহিত্য যেহেতু সমাজের দর্পণ, তাই সমাজের এই বাস্তব রূপ সাহিত্যের মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত হয়। এক্ষেত্রে ‘কথাসাহিত্য সবচেয়ে সম্ভাবনাময় প্রতিবেদন’ হিসেবে উল্লিখিত হয়। এ প্রসঙ্গে প্রকাশচন্দ্র মণ্ডল বলেছেন –

“সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য সন্ধানের ক্ষেত্রে কথাসাহিত্য সবচেয়ে সম্ভাবনাময় প্রতিবেদন। দেশ-কালের বৃহৎ ফ্রেমে বাঁধা হয় উপন্যাসের ঘটনাসমূহ; নানা স্বরের দ্বন্দ্বময়তায়, নানামুখি সংঘাতে চিহ্নিত হয় ভিন্ন সময়ের অবয়ব, অনেকটাই প্রত্যক্ষগম্য হয়ে ওঠে সামাজিক বিকাশ ও বিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতময় স্তরসমূহ।”<sup>২</sup>

বাংলা উপন্যাসের বিকাশে সমাজবাস্তবতার প্রতিফলন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ধারাবাহিক প্রবণতা। ঊনবিংশ শতকে এই ধারার সূচনা ঘটে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় তা ক্রমশ গভীরতা ও বিস্তার লাভ করে। এই দীর্ঘ সাহিত্য পরম্পরায় সমাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব, শ্রেণীগত সংঘাত, মানবিক সংকট এবং ব্যক্তিমানসের জটিলতা উপন্যাসের প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। উত্তর-আধুনিক পর্বে এসে সমাজ বাস্তবতার এই রূপ আরও সূক্ষ্ম, মনস্তাত্ত্বিক এবং অন্তর্মুখী রূপ ধারণ করে। এই ধারার একজন উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্যিক হলেন অনিতা অগ্নিহোত্রী।

অনিতা অগ্নিহোত্রীর উপন্যাসে সমকালীন সমাজের বহুমাত্রিক বাস্তবতা গভীর শিল্পচেতনা ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর সাহিত্যকর্মে প্রধানত প্রান্তিক মানুষের জীবনসংগ্রাম, পারিবারিক জটিলতা, নারীর অস্তিত্বগত সংকট, নগরজীবনের যান্ত্রিকতা এবং সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর উপন্যাস শুধুমাত্র ঘটনানির্ভর আখ্যান নয়; বরং সমাজের গভীরে প্রোথিত বৈষম্য, অসংগতি ও সংকটকে উন্মোচিত করার একটি শক্তিশালী

শিল্পমাধ্যম। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা তাঁর ‘মহলডিহার দিন’ উপন্যাসের সমাজবাস্তবতার নানান দিক উন্মোচনে প্রয়াসী হবো।

অনিতা অগ্নিহোত্রী নিজে একজন আই. এ. এস অর্থাৎ প্রশাসক পদে কর্মরত ছিলেন। কর্মসূত্রে তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরেছেন এবং প্রত্যক্ষ করেছেন সমাজ ও সমাজে অবস্থানরত জনজীবনকে। নগরজীবনের পাশাপাশি প্রত্যন্ত গ্রামের প্রান্তিক জীবনকেও তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাঁর সেই উপলব্ধি অর্থাৎ সমাজের বাস্তব রূপই তাঁর সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে কার্তিক লাহিড়ী বলেছেন, -

“ঔপন্যাসিকের পক্ষে সমাজ সংসারের দিক থেকে মুখ ফেরানো অসম্ভব, কারণ সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় উপন্যাসে মানবিক ও সামাজিক জীবনযাত্রার পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় অতি প্রয়োজনীয়, এবং এই সম্বন্ধ নির্ণয়ে ঔপন্যাসিকের বাস্তব জ্ঞান ও বাস্তব বোধের তর-তম-এর উপরই উপন্যাসের সাফল্য অসাফল্য শ্রেষ্ঠত্ব নিকৃষ্টত্ব নির্ভরশীল, যদিও বাস্তব জ্ঞান ও বাস্তব বোধ ভাষা ভাষা সহজ সরল ব্যাপার নয়, সেজন্য বৈষয়িক বুদ্ধির কুটিলতাও অপ্রয়োজনীয়, কারণ উভয় ক্ষেত্রে অন্তর্দৃষ্টি নিদারুণভাবে শূন্য, ঔপন্যাসিক বাস্তবতার জন্য অন্তর্দৃষ্টি একান্ত অপরিহার্য। এই অন্তর্দৃষ্টির বলেই ঔপন্যাসিক অতীত ও বর্তমানের উপরের বাস্তবতা পেরিয়ে যা বহমান ও সমৃদ্ধ সেই প্রকৃত বাস্তবের অতলাস্তে ঝাঁপ দিয়ে জীবন সামগ্র্য তুলে ধরতে সক্ষম হন, সে হিসেবে ঔপন্যাসিকের অন্তর্দৃষ্টি দূরদৃষ্টির সামিল।”<sup>৩</sup>

অনিতা অগ্নিহোত্রীর অন্তর্দৃষ্টি এবং দূরদৃষ্টির ফলই বাস্তবসম্মতভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর ‘মহলডিহার দিন’ উপন্যাসে। উপন্যাসটির মূল প্রেক্ষাপট ব্রাহ্মণী নদী এবং নদী তীরবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। ঔপন্যাসিক অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে গ্রামীণ জীবনের প্রকৃতি, ঋতুর পরিবর্তন, শ্রমের রীতিনীতি ও লোকজ সংস্কৃতির চিত্র তুলে ধরেছেন। মহল ফুল সংগ্রহ, বননির্ভর জীবিকা এবং অনিশ্চিত কৃষিকাজের মধ্য দিয়ে মানুষের প্রতিদিনের লড়াই ও সংগ্রামের বাস্তব চিত্র এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে -

“আদিবাসী জীবন্ত মহলকে কাটবে না প্রাণ থাকতে। মহলের ফল ও ফুল, এদের সারাবছর অনাহার থেকে বাঁচিয়ে রাখে। শুধু ফুলের গাঁজে ওঠা পানীয়ই নয়, গরমের দিনে মহলের ফল জলে সেদ্ধ করে খেয়ে বেঁচে থাকে কত পরিবার। কিন্তু বাইরে থেকে আসা, অন্য জেলা থেকে আদিবাসী জেলায় এসে বসত করা সম্পন্ন চাষী ও বণিককুল কোনও মমতা দেখানোর দায়বদ্ধতা অনুভব করেনি এই গাছগুলির প্রতি-সামগ্রিকভাবে অরণ্যের ও অরণ্যের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের প্রতি।”<sup>৪</sup>

মহলগাছকে কেন্দ্র করে অঞ্চলটির নামকরণ হয়েছে ‘মহলডিহা’, যা প্রমাণ করে স্থান এবং মানুষের জীবনযাত্রার অঙ্গসংযোগ কত গভীর। পূর্বে এই অঞ্চলে বসবাস করতো মাটির আদি সন্তানরা— মুণ্ডা, ওঁরাও, কন্ধ ও জুয়াংগ সম্প্রদায়। প্রতিটি সম্প্রদায়ের জীবনধারণ, ঘরবাড়ি নির্মাণ, আচার-অনুষ্ঠান ও চাষাবাদ স্বতন্ত্র হলেও বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও সমাজবন্ধনের ঐক্য তাদের একত্র ধরে রেখেছে। লেখিকা লিখেছেন—

“পুরনো বলেই বিশাল তার ডালপালা ও পাতার বিস্তার। কেমন যেন মনে হয় এই গাছটির নামেই এই গাঁয়ের নাম হয়েছিল মহলডিহা-হয়তো অনেক শো বছর আগে। কারণ এ তল্লাটে আর মহলগাছ নেই, একদা ছিল। সমূলে স্বর্গগত হয়েছে। অনেকদিন আগে এ অঞ্চল ছিল মাটির যারা আদি সন্তান, সেই মুণ্ডা, ওঁরাও, কন্ধ ও জুয়াংগদের।...একটি সম্প্রদায়ের মধ্যেও আবার নানা উপসম্প্রদায়, অনেক রকমের রীতি রেওয়াজ। নাচ-গান, পুজো-পার্বণ, বিয়ে-থা, ঘর বাঁধার ধরনধারণ-সবই আলাদা। জুয়াংগদের একধরনের চাষ-বাস, মুণ্ডাদের একধরনের। গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে জীবনযাপনের বস্তুগত দিকগুলি দ্রুত বদলালেও, বিশ্বাস, সংস্কৃতি আর সমাজবন্ধনের এক নিভৃত স্রোত আগের মতনই বয়ে যাচ্ছে দুই কূলকে ধারণ করে।”<sup>৫</sup>

দুর্গম পাহাড়ে ঘেরা অরণ্যসঙ্কুল অঞ্চলে বসবাসকারী জুয়াংগ আদিবাসীরা দৈনন্দিন জীবনে নানা জটিলতার সম্মুখীন। রাস্তা-পরিবহণের অভাব, প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা না থাকায় তাদের জীবন প্রায়শই বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। কলেরা, অন্ত্রজ্বর বা অন্যান্য অসুস্থতার ঘটনাও প্রায়শই জেলাশহরের নজরে আসে না। জুয়াংগদের জীবনধারা সম্পর্কে নির্মলকুমার বসু উল্লেখ করেছেন—

“বাস্তবিক জুয়াঙ্গেরা সবই খায়। সকালে উঠিয়া পুরুষেরা বনে কাঠ কাটিত, চুপড়ি তৈয়ারি করার জন্য বাঁশ আনিতে চলিয়া যায়, আর স্ত্রীলোকেরা ফল-মূল, কন্দ, লালপিঁপড়ার ডিম প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে যায়। লালপিঁপড়ার ডিম তাহাদের খুব প্রিয় খাদ্য। আগে জুয়াঙ্গেরা বনে শিকার করিয়া খাইত, আজকাল সে-সব জঙ্গল রাজার খাস হইয়া যাওয়ায় শিকার বন্ধ হইয়াছে, তাহাদের দুর্দশার সীমা নাই। কোনো রকমে বাঁশের জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া দিন গুজরান করে।”<sup>৬</sup>

জুয়াংগদের সামাজিক নিয়মও জটিল এবং অনন্য। এক পরিবারের মধ্যে ছেলে-মেয়ের বিবাহ হয় না; গ্রামের ছেলে-মেয়ের মধ্যেও বিবাহ বন্ধন হয় না। গ্রামকে এরা একক পরিবার হিসেবে বিবেচনা করে। তাই বিয়ের জন্য অন্য গ্রাম থেকে মেয়েকে আনা হয়। এদের প্রধান দেবতা ধরম দেও। তাঁকে দেবতা হিসেবে মান্য করা হলেও কোনো মূর্তি বা চাক্ষুষ পূজো নেই। উপন্যাসে লেখিকা লিখেছেন—

“গাঁ-ই ওদের পরিবারের মতন। তাই গাঁয়ের মেয়েপুরুষে বিয়ে হয় না, মেয়ে আসে বাইরের গ্রাম থেকে। ধরম দেও নাকি এই পৃথিবী তৈরি করেছেন, এই পাহাড়, বৈতরণী নদী, এই গাছপালা। অথচ ধরম দেও-এর মূর্তি নেই কোথাও। মন্দির নেই। গ্রাম দেবীর পূজো হয় অবশ্য, পাথরে সিঁদুর-তেল চড়িয়ে। ধরম দেও কিন্তু কাউকে কোনও চাক্ষুষ মহিমায় দেখা দেন না। হয়তো অনেক রাতে, যখন শালফুলের গন্ধে মিশে যায় পাহাড়ি জ্যোৎস্না, সোদা মাটির ওপর খেলা করে আলো ও ছায়া সঙ্গমরত আদিম নারী পুরুষের মতন, অরূপ এই দেবতা নিঃশব্দে হেঁটে যান উপত্যকা পেরিয়ে, এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। তাঁর দেহের কাস্তুরি গন্ধে ঘুমের মধ্যে জেগে উঠে থাবা লেহন করে নেয় দুর্দান্ত চিতা, নারায়ণ পাহাড়ের হাতির শাবক স্বপ্নে তাঁকে দেখে চকিত হয়ে ওঠে।”<sup>৭</sup>

এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে জুয়াংগদের জীবনচক্রে দারিদ্র্য ও খাদ্যাভাবের কারণে বন্ধ্যাকরণ একটি বাস্তবতা হয়ে দাঁড়ায়। চৈত্র-বৈশাখ মাসে কাজের অভাব, খাদ্যসংকট ও অপরিষ্কৃত সম্পদ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এই প্রথা চালু রাখে। যাদের সন্তান কম, দারিদ্র্য বা অপুষ্টির কারণে প্রাণহানির ঝুঁকি থাকে, তাদের পরিবার সন্তানহীন হয়ে পড়ে।

এই উপন্যাসে কমলিকা মুখার্জি শ্রীবাস্তব একটি কেন্দ্রীয় নারীচরিত্র; যার জীবানানুভব, মানসিক দ্বন্দ্ব, সামাজিক অবস্থান ও আত্মসন্ধানের মধ্য দিয়ে নারীর আত্মচেতনা ও স্বাভাবিক বীরে বীরে উন্মোচিত হয়। বাবলি ওরফে কমলিকা একজন শিক্ষিতা, শহুরে মধ্যবিত্ত নারী। মছলডিহার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে প্রশাসক হিসেবে সেখানে আসার পর। মছলডিহা শুধুমাত্র একটি গ্রাম নয়, এটি কমলিকার জীবনে এক মানসিক ও আদর্শিক পরিবর্তনের ক্ষেত্র। শহুরে নিরাপদ পরিসর থেকে বেরিয়ে এসে আদিবাসী ও প্রান্তিক মানুষের জীবনের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। অতীত গৌরবসম্বলিত এই মছলডিহা জেলাশহর বাণিজ্যিক সভ্যতার আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মছলডিহার সামাজিক অন্যায়ে, শোষণ ও প্রশাসনিক উদাসীনতার মুখে কমলিকা নিরপেক্ষ দর্শক হয়ে থাকতে পারে না। সে নৈতিক অবস্থান নেয়, যা একজন নারীর সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচায়ক। ঔপন্যাসিক উপন্যাসটির মুখ্য চরিত্র কমলিকার জীবনকে শুধুমাত্র আবেগপ্রবণ বা রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করেননি; বরং সমাজকাঠামোর ভেতরে তার অবস্থান, সীমাবদ্ধতা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার নিরন্তর সংগ্রামকে বাস্তব প্রেক্ষাপটে ও সংবেদনশীলভাবে তুলে ধরেছেন। এখানে কমলিকার জীবনে দুটি দিক এক, তার ব্যক্তি জীবন, দুই তার কর্মজীবন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত জীবনের পাশাপাশি পরবর্তীকালে প্রশাসক হবার পর তার কর্মলিকার

পেশাগত সমস্যা অর্থাৎ এক কর্মজীবী নারীর বাস্তব সমস্যাগুলোকেও গুরুত্বের সঙ্গে প্রাধান্য পেয়েছে। সংসার ও পেশাগত জীবনের দ্বৈত চাপ এবং আত্মমর্যাদা রক্ষার লড়াই ‘মহলাডিহার দিন’ উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ।

মহলাডিহা গ্রামের অস্থির পরিস্থিতির মতো চরম সঙ্কট মুহূর্ত নেমে আসে জনদরদী প্রশাসক কমলিকার জীবনেও। কমলিকার মেয়েবেলা কাটে কলকাতা শহরে। পরবর্তীকালে কর্মজীবনে কলকাতার অফিসের ভিতরের রাজনীতি, কাজের চাপে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লে এই অসহকার পরিস্থিতি থেকে কমলিকা মুক্তির আলো খোঁজে বিবাহ সূত্রে স্বামী সোমনাথের হাত ধরে দিল্লি যাওয়ার মাধ্যমে। কিন্তু প্রেমিক সোমনাথ থেকে স্বামী সোমনাথ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। এরপরে সোমনাথের সন্দেহ প্রবণ মনের সঙ্গে কমলিকার পরিচয় ঘটে। সোমনাথ ও তার মা এবং দিদিও কমলিকার উপর চালায় অকথ্য অত্যাচার। এই অত্যাচার কোনো যৌতুক সম্বন্ধীয় অত্যাচার নয়; টাকা-পয়সা, গয়নাগাটি বা ফ্রিজ টিভির দাবি তারা করেনি, তবে কমলিকার সম্মানে আঘাত করেছে বারবার—

“ফাঁদ থেকে হুঁদুরকে বার করে এনে গায়ে গরমজল ঢেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখত যে বালক ও তার দিদি, তারাই অনেক অনেক দিন পর অনাস্থায়ী একাকী একটি মেয়েকে সুদূর প্রবাসে নতুন নতুন অত্যাচারের পন্থায় জর্জরিত করত। কিন্তুত পোশাক কিনে এনে বলল, পরো। সূর্য মাঝ আকাশে, বলল, যাও, ঠোঁটে চড়া করে লিপস্টিক লাগিয়ে এসো। ওরা মদ খাবে, খাওয়ার পর, সামনের চেয়ারে বসে থাকো, না হলে আমাদের সঙ্গে খাও। রেকর্ড চালিয়ে বলল, নাচো। নাচতেই হবে। সেই বিধ্বস্ত নাচের ছবি তুলে এনলার্জ করে ড্রইংরুমে সাজানো হল। বাড়ি থেকে চিঠি আসে, সেই চিঠির উত্তর ওরা তিনজন পড়লে চিঠি বন্ধ করে পোস্ট করা হবে।”<sup>৮</sup>

আলোচ্য অংশটির মধ্য দিয়ে বোঝা যায় সমাজে দুর্বল ও অসহায়দের প্রতি সহানুভূতির বদলে আনন্দ খোঁজার মানসিকতা কতটা ভয়ঙ্করভাবে বিস্তৃত। উপন্যাসে বর্ণিত এই ঘটনার মাধ্যমে সমাজের সেই বাস্তব রূপ প্রতিফলিত হয়েছে, যেখানে শক্তিশালী শ্রেণি দুর্বলকে দমনে আনন্দ পায়, নৈতিকতা লোপ পায় এবং মানবিকতা নিষ্ঠুরতার কাছে পরাজিত হয়। কমলিকার ওপরে এই অমানবিক অত্যাচার আমাদের সমাজের গৃহবধূর উপর শ্বশুরবাড়ি লোকের অর্থাৎ স্বামী, শাশুড়ি, ননদের অত্যাচার বাস্তবসম্মতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষমতার অসমতা, মানসিক ও শারীরিক অবহেলা ও নির্যাতনের চিত্র উপন্যাসিক কমলিকার জীবনে চিত্রিত করে সমাজের বাস্তব নগ্ন রূপকে প্রতিফলিত করেছেন। এই সমস্ত অত্যাচার কমলিকা নীরবে সহ্য করে। আসলে তার নীরবতা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সে উচ্চকণ্ঠে বিপ্লবী নয়, কিন্তু তার প্রতিবাদ গভীর ও স্থায়ী। প্রথমদিকে সে পরিস্থিতিকে মেনে নেয়, প্রশ্ন তোলে না। কিন্তু ধীরে ধীরে এই নীরবতা ভেঙে সে নিজের রাস্তা খুঁজে বার করে। এটাই তার আত্মচেতনার প্রকাশ। কমলিকার নীরবতা দুর্বলতা নয়, এটি তার আত্মরক্ষার কৌশল। অনিতা অগ্নিহোত্রী এই নীরবতার মধ্য দিয়েই নারীর গভীর প্রতিবাদকে তুলে ধরেছেন। কমলিকা স্বামী, পরিবার ও সমাজের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক নতুন করে বিচার করে। আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে কোনো সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার পক্ষপাতী সে নয়। তাই সে একদিন সুযোগ বুঝে হাত ব্যাগে বাইশ টাকা ও গর্ভে অনাগত সন্তানকে নিয়ে পালিয়ে যায়। এটাকে ঠিক সমস্যা থেকে পালিয়ে যাওয়া বলে না। পরবর্তীকালে সে সোমনাথের মুখোমুখি হয়ে তার দেখানো ভয়কে জয় করেছিল। কমলিকার সেই দুর্দিনের সময় ভালোবেসে সাহায্যের হাত বাড়ায় রঞ্জন শ্রীবাস্তব। রঞ্জন প্রকৃতপক্ষে একজন সুপুরুষ। পরবর্তীকালে সে কমলিকার সন্তান স্বপ্নকে নিজের সন্তান বলে পরিচয় দেয়, কমলিকাকে আবার তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনে।

শুধুমাত্র কমলিকার জীবনবাস্তবতাই নয়, মহলাডিহা অঞ্চলের মেয়েদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বর্ণনা অনিতা সুনিপুণ দক্ষতার সঙ্গে পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন। মহলাডিহার অর্থনৈতিক কৃষি ও বননির্ভর। এই অর্থনৈতিক কাঠামোতে নারীর শ্রম অপরিহার্য হলেও তা প্রায় অদৃশ্য। মহলা কুড়ানো, কাঠ সংগ্রহ, ক্ষেতের কাজ, পশুপালন – সব ক্ষেত্রেই নারী সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। কিন্তু অর্থনৈতিক লাভের উপর মেয়েদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। মেয়েরা কেউ ছাগল চরায়, কেউ গোবর কুড়ায়, ঘুঁটে দেয়, আবার কেউ বা ঘরের যাবতীয় কাজ করে, জল আনে, ছোট ভাইবোনকে দেখাশোনা করে;

আবার কেউ কেউ তামাক ও বিড়ি পাতা নিয়ে বিড়ি বানায় এবং সন্ধ্যাবেলায় ফ্যাঙ্কির লোকজন এসে মজুরি দিয়ে বিড়ি নিয়ে যায়। স্কুলের খাতায় তাদের নাম থাকলেও আসলে তারা স্কুলে যায় না। এদের জন্য চাকরিতে সংরক্ষণ থাকলেও এরা শিক্ষার অভাবে চাকরি পর্যন্ত পৌঁছায় না। অভাব, দারিদ্র্য এতটাই প্রকট হয়ে যায় যে নারীরা হয়ে যায় হতশ্রী, কুৎসিত জরতী। আর মেয়েরা অভাবের তাড়নায় বাইরের ব্যবসাদারের, ভিন্ন রাজ্যের ট্রাক ড্রাইভারের লালসার শিকার হয়, তারা হয়ে ওঠে বারবণিতা -

“এক একটি দিন দীর্ঘ দিন, ক্ষিদেয় রোগে, দৈন্যের চাবুক খেয়ে কাটতে যেন আর চায় না। পুরুষ অকালে বৃদ্ধ হয়ে যায়, তার বুকের পাঁজর খেয়ে যায় যক্ষ্মা, রমণী হয়ে যায় হতশ্রী, কুৎসিত জরতী; যৌবন না ফুরোতেই যৌনরোগে ঝাঁজরা হয়ে শূন্য হয়ে যায় বারবণিতা। হ্যাঁ, বাইরের ব্যবসাদারেরা আসে, ভিন গাঁয়ের লোকেরা আসে, আসে অনন্তযৌবন উত্তর ও দক্ষিণ রাজ্যের ট্রাকড্রাইভারেরা- হাটতলার সীমানা ঘেঁষে চালাঘরগুলি এই দুই ওয়ার্ডের যুবতী অভাবী মেয়েদের ফুসলিয়ে নিয়ে যায়, নারী মাংসের তাজা যোগানোর জন্য।”<sup>১৯</sup>

এখানে দারিদ্র্য, রোগ, নৈতিক অবক্ষয় ও শোষণের চিত্র বাস্তবসম্মতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক এখানে সমাজের অন্ধকার দিককে নির্মম সত্যের আলোয় উন্মোচিত করেছেন, যা পাঠককে নাড়া দেয় এবং ভাবতে বাধ্য করে।

কমলিকা এইসব মেয়েদের হতভাগ্য, দুর্দশাগ্রস্ত জীবন খুব কাছ থেকে দেখেছে, তাদের ব্যথা-যন্ত্রণায় সমব্যথী হয়েছে এবং এর থেকে পরিত্রাণের জন্য সে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে, স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করার প্রয়াস চালিয়েছে। মেয়েরা দিনে সংসারের যাবতীয় কাজে ব্যস্ত। তাই তারা জঙ্গলের কাঠ, পালা-পাতা ইত্যাদি বিক্রি করে কেরোসিন কিনে তা দিয়ে হ্যারিকেনের আলোতে পড়াশোনা চালিয়ে যায়। মছলডিহার এইসব লাঞ্চিত, বঞ্চিত নারী চরিত্রদের তুলনায় কমলিকা ভিন্ন সামাজিক অবস্থান থেকে এলেও তাদের সঙ্গে তার সংযোগ নারীজীবনের সার্বজনীন সত্যকে তুলে ধরে। এই সবকিছুর সমন্বয়ে আলোচ্য উপন্যাসে নারীর সামাজিক বাস্তবতা এক গভীর, বাস্তবধর্মী ও বহুমাত্রিক রূপ লাভ করেছে।

মছলডিহার যেসব নারীদের জীবন, শ্রম দারিদ্র্য ও সামাজিক অবহেলায় আবদ্ধ, তা কমলিকার চেতনায় গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাদের সংগ্রাম, সহনশীলতা ও আত্মমর্যাদা কমলিকাকে ব্যথিত করে তোলে। এরকমই এক নারী বুধবারী মুন্ডা। জমিতে চাষের জন্য বলদের প্রয়োজন। চড়া দাম দিয়ে বলদ কেনার সামর্থ্য বুধবারীর নেই। তাই সে পঞ্চগয়েতের কাছে লোনের দরখাস্ত করে। খাতায় তার লোনের পরিমাণ উঠে গেলেও বাস্তবে সে লোন পায় না। কারণ পঞ্চগয়েত যুক্তি দেখায় স্বামী মারা যাওয়ায় বিধবা বুধবারী লোন শোধ করতে পারবে না। বুধবারীর নামে কোনো জমি নেই। জমি তার স্বামীর নামে। পঞ্চগয়েতের সেক্রেটারি বলে -

“বিধবাকে আমরা লোন দিই না। যার নামে জমি সে গেল স্বর্গে। মেয়েছেলে তুই চাষ করে লোন শুধবি! সরকারি পরম্পরা নিজের অসহায়তায় ভেঙে ফেলার লজ্জায় বুধবারী বেগুনি রং লাগা আঙুল নিজের রুখু মাথায় মুছতে মুছতে বোকার মতন হাসে। মনজুর মিয়া হাসে। ফিল্ড অফিসারও হাসেন। সবার হাসির আলাদা আলাদা মানে।”<sup>২০</sup>

এখানে গ্রামীণ সমাজের পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা, প্রশাসনিক বৈষম্য, নারীর অসহায়তা এবং ক্ষমতাবানদের নিষ্ঠুরতা একসঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। বুধবারীর অবস্থার মধ্য দিয়ে বিধবা নারীর সামাজিক অবমূল্যায়ন তুলে ধরা হয়েছে। স্বামী মারা যাওয়ার পর বুধবারী আর পূর্ণ মানুষ হিসেবে গণ্য হয় না। পঞ্চগয়েতের যুক্তি— “বিধবাকে আমরা লোন দিই না”— এই কথার মধ্যই সমাজের গভীরে প্রোথিত কুসংস্কার ও নারী-বিদ্বেষ স্পষ্ট। এখানে নারীর শ্রম, দক্ষতা বা ইচ্ছার কোনো মূল্য নেই; তার পরিচয় নির্ধারিত হয় কেবল স্বামীর মাধ্যমে। আবার জমির মালিকানার প্রশ্নে আইনি ও সামাজিক বাস্তবতা ফুটে উঠেছে। বুধবারী চাষ করতে চায়; কিন্তু জমি তার নামে নয়, স্বামীর নামে। ফলে বাস্তবে চাষের দায়িত্ব তার হলেও কাগজে-কলমে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। এই ঘটনা গ্রামীণ সমাজে নারীর সম্পত্তির অধিকার না থাকার বাস্তব চিত্র তুলে ধরে।

প্রশাসনিক নিষ্ঠুরতা ও ভণ্ডামি এখানে প্রকট। খাতায় লোনের নাম উঠলেও বাস্তবে লোন দেওয়া হয় না। অর্থাৎ সরকারি নিয়ম শুধু কাগজে আছে, মানুষের জীবনে তার কোনো প্রয়োগ নেই। পঞ্চায়েতের সেক্রেটারির বিদ্রূপাত্মক ভাষা— “মেয়েছেলে তুই চাষ করে লোন শুধবি!” ক্ষমতাবান শ্রেণির অহংকার ও দুর্বল মানুষের প্রতি তচ্ছল্য প্রকাশ করে। আর হাসির প্রতীকের মাধ্যমে সমাজের বহুমাত্রিক নিষ্ঠুরতা দেখানো হয়েছে। একদিকে বুধবারীর বোকার মতো হাসি তার অসহায়তা ও আত্মসম্মান ভাঙনের প্রতীক এবং অন্যদিকে মনজুর মিয়া ও ফিল্ড অফিসারের হাসি ক্ষমতার আনন্দ ও নিষ্ঠুর উপভোগের প্রকাশ। “সবার হাসির আলাদা আলাদা মানে”—এই বাক্যে সমাজের শ্রেণিভেদ ও মানসিক দূরত্ব গভীরভাবে ধরা পড়ে। অর্থাৎ গ্রামীণ সমাজের বাস্তব চিত্র—নারীর প্রতি অবিচার, বিধবার প্রতি বৈষম্য, প্রশাসনের মানবহীনতা ও সামাজিক অন্যায্য অত্যন্ত জীবন্ত ও মর্মস্পর্শীভাবে ফুটে উঠে ওঠে।

অনিতা অগ্নিহোত্রী উপন্যাসের শুরুতেই কমলিকা চরিত্রের মাধ্যমে স্পষ্ট করে দেন যে তাঁর মূল লক্ষ্য জনসমাজেরই কথা বলা। সুখময় রোমান্টিক কাহিনীর আবহের মধ্যেও তিনি স্বচ্ছন্দে যুক্ত করেন নাগরিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত মানুষের জীবনসংগ্রামের কথা। রঞ্জন ও কমলিকার আপাত সুখের আড়ালেও কমলিকার চেতনায় ভেসে ওঠে সমাজের নানা অসাম্য ও বৈষম্যের চিত্র। ব্রাহ্মণী নদীর সন্নিকটে সেতু নির্মাণে সরকার ও ঠিকাদারদের যৌথ গাফিলতির কারণে সেতুর কাজ সম্পূর্ণ হতে বিলম্ব হয়। ফলে দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের দৈনন্দিন জীবনযাপন আরও জটিল এবং সংকটময় হয়ে ওঠে। এই আঞ্চলিক মানুষদের দুঃখে সমব্যথী হয়ে ঔপন্যাসিক আক্ষেপের সঙ্গে বলেন –

“দেশলাই বাক্স থেকে আরম্ভ করে হোমিওপ্যাথির গুলি যে-দেশে নৌকায় চেপে আসে, সে-দেশে নৌকার মালিক আর ঠিকাদারদের রমরমা চলবেই; তাদের দয়ার ছিঁটেফোঁটার ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হবে মানুষদের। এমন কথাও শোনা যাচ্ছে, ঠিকাদারদের ব্যবসা যাতে বহাল তবিয়তে থাকে, সেইজন্যই নাকি ব্রিজের কাজ ফুরোচ্ছে না।”<sup>১১</sup>

একটি অঞ্চলে দেশলাই বাক্স বা হোমিওপ্যাথির মতো অতি সামান্য এবং অতিপ্রয়োজনীয় জিনিসও যেখানে নৌকায় করে নিয়ে আসতে হয়, স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় সেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা কতখানি উন্নত! যোগাযোগ ব্যবস্থার এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সবচেয়ে ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে নৌকার মালিক ও ঠিকাদাররা। ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাপন তাদের দয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। একদিকে সুবিধাভোগী প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং অন্যদিকে অসহায়, দরিদ্র সাধারণ মানুষ—এখানে সমাজের শ্রেণিবৈষম্য স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। ব্রিজের কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে শেষ না করার মধ্য দিয়ে স্বার্থাশ্বেষী মানুষের মানসিকতা এবং প্রশাসনিক দুর্নীতির বাস্তব রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। উন্নয়নকে আটকে রাখার কারণ উন্নয়ন হলে ঠিকাদারদের লাভ কমে যাবে। অর্থাৎ সমাজে উন্নয়ন সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য নয়; বরং কিছু স্বার্থাশ্বেষী মানুষের ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে ঔপন্যাসিক সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের অসহায়তার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন, যা সমাজবাস্তবতার এক তীব্র ও সত্যনিষ্ঠ প্রতিফলন।

যখন সমাজের কাঠামো পরিবর্তিত হয়, তখন সেই অঞ্চলে বসবাসকারী জনজাতির জীবন ও জীবিকাও অনিবার্যভাবে পরিবর্তিত হয়। অনিতা অগ্নিহোত্রীর ‘মহলডিহার দিন’ উপন্যাসে এই পরিবর্তনের প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষ করে বিশাই মুণ্ডা চরিত্রের জীবন তা সূক্ষ্মভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশাই-এর দায়িত্বে ছিল নৌকার হেল্লারি, যাত্রীর ওঠা-নামার ব্যবস্থাপনা, নৌকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, তেল-মবিল চেকিং সহ নৌকার সকল দৈনন্দিন কাজ দেখাশোনা করা। আর রমেন নৌকা চালক। কিন্তু নদীতে ব্রিজ নির্মাণের ফলে বিশাই-এর জীবন ও জীবিকা একেবারেই স্তব্ধ হয়ে যায়। ব্রিজের কারণে নৌকার কাজ শেষ হয়ে যায়; মানুষ, পশুপাখি, শেয়াল-কুকুর সকলেই এখন পায়ে হেঁটে নদী পার হতে পারে। ফলে বিশাই বাধ্য হয়ে ইটভাটার শ্রমিক দলের সঙ্গে কাজ করতে যান। লেখিকা উল্লেখ করেছেন—

“ব্রিজ শেষ হলে একদিন শেয়ালকুকুরও পায়ে হেঁটে নদী পেরোবে, সে দিন আসছে অতি শিগগিরই, শেষ পর্যন্ত মানতে পারেনি বিশাই। এরই মধ্যে বিশাই এর বউ ওর ছেলেমেয়েগুলিকে নিয়ে যাত্রা

করেছে ইটভাটার উত্তরমুখী দলের সঙ্গে। সেও এই আশ্বিনের গোড়ায়। শীত আসছে। বর্ষা শেষ হয়ে এখন বকঝকে পরিকার আকাশ। ইট ভাটার কাজ শুরু হবে কার্তিকের গোড়াতেই।”<sup>২২</sup>

বিশাই-এর জীবনধারা ও অর্থনৈতিক সংগ্রাম অদ্বৈত মল্লবর্মণের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসের মালোপাড়ার জেলেদের সঙ্গে অদ্ভুত মিল রাখে। যেমন সেখানে জলের মাত্রা কম হলে জেলেরা নৌকা বওয়া বা মাছ ধরা বন্ধ করে কৃষিকাজে নেমে পড়ে, ঠিক তেমনি এখানে বিশাই-এর স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে ইটভাটার শ্রমিক দলের সঙ্গে মিশে যায়। এই মিল সমাজের সংকটকে আরও বাস্তবধর্মী ও সংবেদনশীল করে তোলে।

‘মহলডিহার দিন’-এ ভজমন জুয়াংগ, বিশাই ও ইগনেস নামক তিনটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে অনিতা অগ্নিহোত্রী জনজাতি জীবনের চলমান পরিবর্তন, সংঘাত ও আত্মসন্ধানের যাত্রাকে এক মহাকাব্যিক বর্ণনায় রূপ দিয়েছেন। এরা প্রত্যেকেই কোনো এক স্থবির সমাজব্যবস্থা থেকে ইতিহাসের নতুন প্রান্তরে পৌঁছাতে চায়—যেখানে পুরাতন সংস্কৃতি ও আধুনিকতার দ্বন্দ্ব এক অদৃশ্য সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এই দ্বন্দ্ব, এই যন্ত্রণার ভেতর দিয়েই তাদের পরিচয় নব্যায়িত হয়। এক অর্থে, এই উপন্যাস জনজাতি জীবনের এক ‘কালোত্তীর্ণ রূপান্তরগাথা’, যেখানে প্রান্তিক মানুষদের কণ্ঠস্বরকে সাহিত্য-চেতনার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই বৈপ্লবিক আখ্যানরীতি আমাদের মনে করিয়ে দেয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’—যেখানে কাহারদের জীবনের আধুনিকতার মুখোমুখি সংঘর্ষ একইভাবে সমাজের পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে।

অনিতা অগ্নিহোত্রী সমকালীন বাংলা সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক। তাঁর সাহিত্যকর্ম সমাজবাস্তবতার গভীর অন্বেষণে নিবদ্ধ। তিনি এমন এক সময়ে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন, যখন সমাজে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে—পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ে, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে এবং মানুষের জীবনে নিঃসঙ্গতা বাড়তে থাকে। এই পরিবর্তিত সমাজবাস্তবতাই তাঁর উপন্যাসের মূল পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে। তিনি মনে করেন সাহিত্য নিছক কল্পনার রোমান্টিক প্রকাশ নয়; বরং সমাজের অন্তর্নিহিত সত্য উন্মোচনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। সেই কারণে তাঁর রচনায় অলংকারের বাহুল্যতা বা অতিনাটকীয়তা অনুপস্থিত; পরিবর্তে বাস্তব জীবনের সহজ ও স্বাভাবিক চিত্র ফুটে ওঠে। তাঁর ভাষা সংযত, সংবেদনশীল এবং চরিত্রের মানসিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মানুষই অনিতা অগ্নিহোত্রীর সাহিত্যচিন্তার কেন্দ্রবিন্দু—বিশেষত নারী ও প্রান্তিক সমাজ। নারীর সামাজিক অবস্থান, আত্মপরিচয়ের সংকট এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তার সংগ্রামকে তিনি গভীর সহমর্মিতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। পাশাপাশি তাঁর উপন্যাসে অর্থনৈতিক বৈষম্য, কর্মজীবনের অনিশ্চয়তা এবং নগরজীবনের কঠোর বাস্তবতাও স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সমাজের বাস্তব চিত্রকে কেবল তথ্যনির্ভর বর্ণনা বা প্রতিবেদনের আকারে তুলে ধরা নয়, বরং তাকে নান্দনিক শিল্পরূপে রূপান্তরিত করাই একজন সার্থক ঔপন্যাসিকের প্রধান সাফল্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে অনিতা অগ্নিহোত্রী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর উপন্যাসে সমাজবাস্তবতা শিল্পসম্মত উপস্থাপনার মাধ্যমে গভীর তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। তিনি বাস্তব ঘটনাকে সরাসরি বর্ণনা না করে চরিত্রের অন্তর্জগতের অনুভূতি ও মানসিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। সংলাপ, প্রতীক এবং নীরবতার সূক্ষ্ম ব্যবহার তাঁর শিল্পকৌশলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভাষার সংযত প্রয়োগ ও আবেগের গভীরতা সমাজবাস্তবতাকে আরও জীবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে। ‘মহলডিহার দিন’ উপন্যাস সম্পর্কে অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক ড. শম্পা ভট্টাচার্য্য (বসু)-এর মন্তব্য দিয়ে আমরা এই নিবন্ধের ইতি টানবো —

“উপন্যাসটি পাঠ শেষে এর মহতী সম্ভাবনা মনকে আচ্ছন্ন করে। অনিতা অগ্নিহোত্রীর বিষয় বৈচিত্র্য যাকেই আশ্রয় করুক না কেন, তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাঁর ভাষা। আর সে ভাষার বিবিধ বৈচিত্র্য। কমলিকা, অজয়ন্দ্র, বিশাই মুন্ডা, স্ট্যান এরা সবাই নিজের ভাষায় উজ্জ্বল ও স্পষ্ট। কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে মেদুর হয়ে ওঠে সেই সব অংশটুকু, যেখানে স্বপ্নের মাতৃবিচ্ছিন্ন নিজস্ব জগৎ নিয়ে ক্রমাগত বেড়ে ওঠা, কর্মক্ষেত্র অন্যত্র হওয়ায় দ্বন্দ্ব ক্ষত বিক্ষত হতে হতে কমলিকার দীর্ঘ হয়ে যাওয়া—এক নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনা ধারার মধ্য দিয়ে পল্লবিত হয়েছে উপন্যাসটি।”<sup>২৩</sup>

Reference:

১. কর, পরিমল ভূষণ, 'সমাজতত্ত্ব', দে বুক স্টোর, কলকাতা, ৮ ডিসেম্বর ১৯৬৫, পৃ. ২২
২. মণ্ডল, প্রকাশচন্দ্র, 'কথাসাহিত্যের নানা পাঠ', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ-মহালয়া ২০১১, পৃ. ৮০
৩. লাহিড়ী, কার্তিক, 'বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস', সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ - ১৯৬০, পৃ. ৭
৪. অগ্নিহোত্রী, অনিতা, 'মহলডিহার দিন', আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ - এপ্রিল ১৯৯৬, পৃ. ৬৬
৫. তদেব, পৃ. ৬৪
৬. বসু, নির্মলকুমার, 'বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসীকথা', দীপঙ্কর ঘোষ (সম্পাদিত), অমরভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ১৫৫
৭. অগ্নিহোত্রী, অনিতা, 'মহলডিহার দিন', আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ - এপ্রিল ১৯৯৬, পৃ. ৯৭
৮. তদেব, পৃ. ৮৬
৯. তদেব, পৃ. ৭২
১০. তদেব, পৃ. ৭০
১১. তদেব, পৃ. ১৩
১২. তদেব, পৃ. ১৩৭
১৩. ভট্টাচার্য্য (বসু), শম্পা, 'বহতা সময়ের একলা পথিক; অনিতা অগ্নিহোত্রী', সোপান, কলকাতা, বইমেলা ২০২৫, পৃ. ২৬